ছড়ানো মুক্তা

ইলম অর্জনের মুতাওয়ারিস ধারা

Mahmud Siddiqui

2020-02-28 16:08:56 +0600 +0600

23 MIN READ

১.

"একজন মানুষের ইলম অর্জনের পথ দুটি। এক. মানবকর্তৃক শিক্ষার পথ। দুই. রবকর্তৃক শিক্ষার পথ। প্রথম পথটি সুবিদিত ও সর্বজন স্বীকৃত। মানবকর্তৃক শিক্ষাদানের পদ্ধতি আবার দুটি। এক. বাহ্যিক—ব্যক্তির কাছ থেকে শেখার মাধ্যমে ইলম অর্জন করা। অপরটি হলো—চিন্তাফিকিরের মাধ্যমে ইলম অর্জন করা"। বলেছেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি রহ.। (১) রবকর্তৃক শিক্ষার পথটি নবিদের সাথে বিশিষ্ট। সাধারণ মানুষের শিক্ষার মাধ্যম হলো মানবকর্তৃক শিক্ষার পথ। এখন বিবেচ্য বিষয় হলো—ইলম অর্জনের কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত মুতাওয়ারিস পদ্ধতি কোনটি? আমাদের অনুসরণীয় উত্তরসূরি সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালিহিন কোন পদ্ধতিতে ইলম অর্জন করেছেন?

ইলম অর্জনের কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত মুতাওয়ারিস ধারা মৌলিকভাবে সর্বযুগে একটিই। নববি যুগ থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত; আগামী থেকে ভবিষ্যত পর্যন্ত—সর্বযুগে এটিই থাকবে মৌলিক ও সহিহ ধারা হিসেবে। এই মুতাওয়ারিস ধারাটি হলো—কোনো একজন উস্তাদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করা। কুরআনে ইলম অর্জনের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে যে-আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে আয়াতের ভাষ্য হলো—"*যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো*"। (২) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসকল দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো—শিক্ষাদান। যার ঘোষণা কুরআন দিয়েছে এভাবে—(ইবরাহিম আলাইহিসসালাম দুআ করছেন—) "*প্রভু, আপনি তাদের মাঝে প্রেরণ করুন তাঁদের মধ্য থেকে একজন রাসুল; যিনি তাদেরকে তিলাওয়াত করে শোনাবেন আপনার আয়াতসমূহ এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমত; এবং পরিশুদ্ধ করবেন তাদেরকে...*"। (৩) আয়াতে বর্ণিত রাসুল হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; কিতাব হলো কুরআন এবং হিকমত হলো সুন্নাতে নববি। (৪)

তো, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিসসালামের দুআ বিবৃত করার মাধ্যমে নবিজির মোট চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এক. নাযিলকৃত কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানো। দুই. কিতাব শিক্ষা দেওয়া। তিন. হিকমত শিক্ষা দেওয়া। চার. এবং উম্মতকে তাযকিয়া তথা পরিশুদ্ধ করা। কিতাব এবং হিকমত—এদুটিই হলো ইলম। আর এদুটি শেখার মাধ্যম কুরআনে বিবৃত হচ্ছে তা'লিম শব্দে; যার অর্থ—অপরকে শেখানো। একইভাবে হাদিসে নববিতেও স্বয়ং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন এভাবে—"*নিঃসন্দেহে আমি প্রেরিত হয়েছি মুআল্লিম (শিক্ষক) হিসেবে*"। (৫) যেহেতু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাই সাহাবায়ে কেরামকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয় শিক্ষা দিতেন। এমনকি ইস্তেঞ্জা কীভাবে করতে হবে—তাও শিখিয়ে দিতেন। শিক্ষা দিতে গিয়ে বলছেন—"*আমি তোমাদের পিতার মতো, তোমাদেরকে শেখাই...*"। (৬)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসগুলোতে ইলম অর্জন ও ইলম শেখানোর ব্যাপারে নির্দেশনা ও ধারাবর্ণনা দিয়ে যে-দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো—তা'লিম ও তাআল্লুম। প্রথমে শব্দদুটির অর্থ জেনে নেওয়া যাক। এক কথায় তা'লিম হলো কোনো ব্যক্তিকে শিক্ষাদান; আর তাআল্লুম হলো কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ। আধুনিক আরবিভাষা অভিধানের রচয়িতা ড. আহমদ মুখতার আব্দুল হামিদ (১৪২৪ হি.) লেখেন—"**তা'লিম হলো—ছাত্রদেরকে বিভিন্ন উলুম ও ফুনুন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্র পাঠদান করা**"। (৭)

আল্লামা মুরতাযা যাবিদি (১২০৫ হি.) রচিত সুবিশাল অভিধানগ্রন্থ তাজুল আরুসে লেখেন—"কতক ভাষাবিদ বলেন, তা'লিম

হলো—পাঠের অর্থগ্রহণের ব্যাপারে ব্যক্তিকে নির্দেশনা দেওয়া। আর তাআল্লুম হলো ব্যক্তিকর্তৃক সেই নির্দেশনা গ্রহণ করা। (৮) অর্থাৎ, তা'লিম ও তাআল্লুম শব্দদুটো স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিকে ইলম শেখানো বা ব্যক্তির কাছ থেকে ইলম অর্জন করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? আরেকটু খোলাসা করা যাক।

ইলম অর্জনের পদ্ধতি কী হবে—এই নির্দেশনা দিতে গিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাষায় বলছেন এভাবে—"ইন্নামাল ইলমু বিত-তাআল্লুম; অর্থাৎ ইলম অর্জনের একমাত্র পদ্ধতি হলো তাআল্লুম"। (৯) হাদিসে বর্ণিত এই বাক্যটির প্রথম শব্দ হচ্ছে—'ইন্নামা'। আল্লামা ইবনে মানযুর (৭১১ হি.) বলছেন—"ইন্নামার অর্থ হলো এর পরের অংশকে সুসাব্যস্ত করা এবং এছাড়া অন্য সবকিছুকে নাকচ করা"। (১০) মূল শব্দটি 'ইন্না', নিশ্চয়তাজ্ঞাপক শব্দ। এর পরে 'মা' যুক্ত হয়ে যখন 'ইন্নামা' হয়—তখন আরবি ব্যাকরণের নীতি অনুযায়ী শব্দটি তার পরের বাক্যের দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশের সাথে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে ফেলে। নাহুর ভাষায় যাকে বলে—'হাসর'। (১১) বাংলায় এক শব্দে এর অর্থ হয়—'শুধু, কেবল', এই জাতীয় শব্দ। এখানে বাক্যের প্রথম অংশ ইলম, দ্বিতীয় অংশ তাআল্লুম। অর্থাৎ, তাআল্লুমকে ইলমের সাথে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে ফেলছে। তাহলে হাদিসটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে—"তাআল্লুমের দ্বারা যে-ইলম অর্জিত হয়, কেবল সেটাই ইলম"।

এটা গেল বৈয়াকরণিক আলোচনা। এবার হাদিসটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও মান দেখা যাক।

আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি (৮৫২ হি.) রহ. হাদিসটি উল্লেখ করার পর এর ব্যাখ্যায় লেখেন—" **হাদিসটির অর্থ হলো—একমাত্র গ্রহণযোগ্য ইলম সেটাই, যা নবিগণ ও তাঁদের উত্তরসূরিদের থেকে তাআল্লুমের পদ্ধতিতে অর্জন করা হয়েছে**"। (১২)

হাদিসটি বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে তা'লিক হিসেবে; অর্থাৎ সনদ ছাড়া। ইমাম বুখারি রহ. সহিহ হাদিসগ্রন্থে যেসব হাদিস তা'লিক হিসেবে এনেছেন, সাধারণভাবে সেসবের সর্বনিম্ন মান হলো—হাদিসটি হাসান। অবশ্য খুব সীমিত সংখ্যক হাদিসের ব্যাপারে শাস্ত্রবিদগণ যইফও বলেছেন। উপর্যুক্ত হাদিসটি বুখারিতে তা'লিক হিসেবে এলেও মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে বাযযারে (২৯২ হি.), ইমাম তাবারানির (৩৬০ হি.) আল-মু'জামুল কাবিরে। (১৩) হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. হাদিসটির মান সম্পর্কেমন্তব্য করে বলেছেন—**হাদিসটির সনদ হাসান**। (১৪)

তার মানে দাঁড়াচ্ছে—কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত ইলম অর্জনের যে-পথটির কথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তা হলো—তাআল্লুম তথা কোনো একজন উস্তাদের সান্নিধ্য থেকে ইলম অর্জন করা।

২.

একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে—সাহাবায়ে কেরাম উম্মাহর আদর্শ ও সত্যের মাপকাঠি। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরা শতভাগ আমানতদারির সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন। আমাদের যারা আদর্শ ও অনুসরণীয়, সেই সাহাবায়ে কেরাম ঠিক কীভাবে দ্বীন ও ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেছেন?

এই প্রশ্নের জবাব বিশিষ্ট সিরাত ও ইতিহাস গবেষক, মুফাক্কিরে ইসলাম আলি নদভি দিয়েছেন চমৎকারভাবে। আলি মিয়াঁ লিখেছেন—"**(নববি যুগে) তা'লিম ছিল বাস্তবমুখী তা'লিম। জিহাদের ময়দানে, জীবনের কর্মব্যস্ততায়, ঘরোয়া ঝামেলায় এবং সফরের বিরতিতে—তা'লিম চলত সর্বক্ষেত্রে। শিক্ষা-উপকরণ তখন নিষ্প্রাণ বইপুস্তক ছিল না; বরং শিক্ষার উপকরণ ছিল প্রাণবন্ত ও স্পন্দিত ব্যক্তিপ্রাণ। যার সান্নিধ্য প্রভাব ফেলত সর্বক্ষেত্রে; সকল প্রয়োজনে থাকত তাঁর দিকনির্দেশনা। ফলে মানুষ সান্নিধ্যের সৌরভে ধর্মের বোধ ও এর মাধ্যম ছাড়াই আমল ও প্রায়োগিক ইলম শিখে ফেলত। ভাষা যেমন শিখতে হয় ভাষাভাষীদের মধ্যে থেকে; সভ্যতা শিখতে হয় সভ্য ও মার্জিত মানুষদের সান্নিধ্যে**

থেকে—তেমনি স্বভাবসুলভ পন্থায় মানুষ দ্বীনদারদের সান্নিধ্যে অবস্থান করে দ্বীন শিখত"।

একই প্রবন্ধের পরের পৃষ্ঠায় আলি নদভি আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন—" **সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন শিখেছেন সুহবত ও খিদমত—সান্নিধ্য ও সেবার মাধ্যমে। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নামের পাশে রয়ে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে—তাঁরা দ্বীনের প্রকৃত রূপ-রস ও প্রাণ ধারণ করতে পেরেছিলেন। যেমনটা চমৎকারভাবে চিত্রায়ন করেছেন মহান সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.—'এঁরা হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরবর্গ; হৃদয় তাঁদের সবার চেয়ে সৎ, ইলম তাঁদের সকলের চেয়ে গভীর, আর কৃত্রিমতা তাঁদের মাঝে সবার চেয়ে কম'**।" (১৫)

ইতিহাসও আলি নদভির এই বক্তব্যের শতভাগ সমর্থন করে। হাদিস, সিরাত, তারিখ ও মা'রিফাতুস সাহাবা সংক্রান্ত সকল কিতাব উচ্চকিত কণ্ঠে এই সত্য জানান দেয়। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে একটিমাত্র হাদিসের জন্য জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.-এর সফর।

আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস আল-জুহানি রা.। বাইআতুল আকাবায় যে সত্তুর জন আনসার সাহাবি অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনিও ছিলেন তাঁদের একজন। অংশগ্রহণ করেছেন উহুদ ও পরবর্তী অনেক জিহাদে। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস মদিনা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে গেছেন। মধ্যে মিসরে ছিলেন কিছুদিন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. জানতে পেরেছেন, ইবনে উনাইস সিরিয়ায় আছেন। তাঁর কাছে একটি হাদিস আছে, যা তিনি এখনো শুনেননি। জাবের রা. সিদ্ধান্ত নিলেন—একটিমাত্র হাদিসের জন্য সফর করবেন। ক্রয় করলেন সওয়ারি। এক মাস রিহলাহ করে পৌঁছলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইসের কাছে। (১৬)

৩.

কেবল সাহাবায়ে কেরাম নন, সালাফে সালিহিনের মাঝেও ইলম অর্জনের যে-ধারাটি চলমান ছিল তা হলো—উস্তাদের সাহচর্যে ইলম অর্জন করা। উস্তাদের সাহচর্য লাভের জন্য সে-যুগে রিহলাহ ছিল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। কে কতটি দেশে রিহলাহ করেছে, কতজন শায়খের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছে—ব্যক্তির ইলমি অবস্থান নির্ণয়ের এগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। যার রিহলাহ যত কম, যে যত কম শায়খের সাহচর্য লাভ করেছে, ইলমি বিবেচনায় তার অবস্থান হতো অন্যদের চেয়ে তত নিচে। তারিখ ও রিজালের কিতাবাদি সালাফে সালিহিনের রিহলাহর বর্ণনায় ভরপুর। এমন একজন ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার জীবনে একাধিক রিহলাহর ঘটনা নেই। খোদ এই রিহলাহ নিয়ে খতিব বাগদাদি রহ. (৪৬৩ হি.) স্বতন্ত্র কিতাবই রচনা করে ফেলেছেন। নাম দিয়েছেন—আর-রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস। একটিমাত্র হাদিসের জন্য বিরাট-বিরাট রিহলাহ ছিল তাঁদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার।

তেমনই এক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন আবু দারদা রা.-এর শাগরিদ কাসির ইবনে কায়স রহ.।
তিনি বলছেন—

"একবার আবু দারদা রা.-এর সাথে দামেশকের মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে বলল, 'হে আবু দারদা, আমি মদিনাতুর রাসুল থেকে এসেছি; একটি হাদিসের অন্বেষণে। জানতে পেরেছি আপনি সেই হাদিসটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন'।

—'অন্য কোনো প্রয়োজনে আসোনি'? আবু দারদা অবাক হয়ে জানতে চান।
—'না'। জবাব দেয় লোকটি।
—'ব্যবসার কাজেও আসোনি'? সাহাবি আবার জিজ্ঞেস করেন।
—'না'। শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় আগন্তুক।
—'কেবল এই হাদিসটির জন্যই এসেছ'? আরও অবাক হন আবু দারদা।

—‘জি’। দৃপ্ত কণ্ঠ হাদিস অন্বেষীর।

আবু দারদা রা. বললেন—‘**তাহলে শোনো; আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, সে এর মাধ্যমে মূলত জান্নাতের একটি পথ অবলম্বন করে। আর ফেরেশতারা তো তালিবেইলমের সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেয়। পূর্ণিমা রাতে অন্যসব নক্ষত্রের ওপর চাঁদের যেমন অবস্থান, নিশ্চিতভাবে সাধারণ ইবাদতকারীর ওপর একজন আলিমের মর্যাদা ও অবস্থান অনুরূপ। আর আলিমের জন্য ক্ষমার দুআ করতে থাকে আসমান-যমিনে থাকা সবাই এবং সবকিছু; এমনকি সমদ্রের গহিনের মাছও। নিশ্চিত থেকো, আলিমগণ হলেন নবিগণের উত্তরসূরি। নবিগণ উত্তরাধিকার রূপে পয়সা-কড়ি রেখে যান না; তাঁরা রেখে যান ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করবে সে যেন পূর্ণরূপে অর্জন করে**”। (১৭)

এ তো কেবল দুয়েকটি ঘটনা। এমনতর হাজারও ঘটনা সালাফের জীবনীতে বিদ্যমান। উপরোক্ত কথাগুলো সামনে রেখে যে-বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠছে তা হলো—শুধু খায়রুল কুরুন নয়; বরং আজ অবধি ইলম অর্জনের মুতাওয়ারিস ধারা একটিই—সুহবত ও খিদমত; সান্নিধ্য ও সেবা। সুতরাং ইলম অর্জন করতে হলে আলিমের কাছে যেতে হবেই; এর বিকল্প নেই। বইপুস্তক কিংবা প্রাণহীন জড় কিতাবাদি কখনো এর বিকল্প হতে পারে না।

এই কথাটি আরও সুস্পষ্ট করে বলেছেন বিশিষ্ট গবেষক আলিমে দ্বীন মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ। তিনি লিখেছেন—“**দ্বীন শেখার এবং ইলমে দ্বীন হাসিল করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল, সুনাতের অনুসারী সহীহ আকীদাসম্পন্ন বুযুর্গ ও আলেমে দ্বীনের সোহবত ও নেগরানি (তত্ত্বাবধান ও সাহচর্য অবলম্বন)। দ্বীন শেখার এবং ইলমে দ্বীন হাসিল করার এটাই স্বভাবজাত পথ। ইসলামের শুরু যুগ থেকে এ পর্যন্ত দ্বীন শেখার এ রীতিই চলে আসছে। এর কোনো বিকল্প নেই। বিকল্প থাকা সম্ভবও নয়। তবে এ পন্থা অবলম্বনের পাশাপাশি সহায়ক একটি পন্থা আছে। তা হল, দ্বীনী গ্রন্থ পাঠ করা**”। (১৮)

গাযালি রহ. তা’লিম ও তাআল্লুমের একটি চমৎকার প্রতীকী চিত্র বর্ণনা করেছেন। গাযালি বলছেন—

“**জমিতে যেমন বীজ রোপিত থাকে, গহিন সমুদ্র কিংবা খনি-গহ্বরে থাকে মুক্তোদানা, তেমনি মৌলিকভাবে প্রতিটি মানুষের মাঝে ইলম অর্জনের প্রতিভা বিদ্যমান। তাআল্লুম হলো—সেই প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে চাওয়া; আর তা’লিম হলো—সেই প্রতিভার স্ফুরণ ঘটানো। এজন্য মুতাআল্লিম (ছাত্র) তার মুআল্লিমের সাদৃশ্য অবলম্বন করে নৈকট্য অর্জন করে। সাদৃশ্যের বিচারে সেই আলিম হলেন চাষী, তার শিক্ষার্থী হলো জমি, শিক্ষার্থীর অন্তরে সুপ্ত প্রতিভা হলো বীজ; আর যতটুকুইলম সে বাস্তবে অর্জন করেছে তা হলো উদ্ভিদ। ছাত্রের প্রতিভার স্ফুরণ যখন পূর্ণতা লাভ করবে, তখন সে হয়ে যাবে ফলবান বৃক্ষ**”। (১৯)

৪.

একথা সুবিদিত যে, ইলম অর্জনের এই ধারা আজ অবধি চলমান। এই ধারা শুধু উম্মতে মুহাম্মদির তাওয়ারুস বা উত্তরাধিকার নয়; বরং নবিদের থেকে চলে আসা উত্তরাধিকার। মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা আলি নদভি একথাই বলছেন—“**কিতাব ও পুস্তক ব্যতীত ব্যক্তির কাছ থেকে ইলম শেখা হলো নবিদের অনুসৃত পদ্ধতি। বিশেষ করে সাইয়িদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য। এক কিতাব থেকে অন্য কিতাবে ইলম স্থানান্তর নবিজির শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না। বরং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন রবের কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করে প্রথমে হৃদয়ফলকে লিপিবদ্ধ করতেন। তারপর অন্যদেরকে সেই ইলম শেখাতেন। এই পদ্ধতিতে লাখ-লাখ মানুষ খুব অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় ইলম শিখে নিতে পারত। প্রায় সময় আক্ষরিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আমল ও তাছিরের ক্ষেত্রে যেসব অসম্পূর্ণতার মুখোমুখি হতে হতো, এই পদ্ধতি তা থেকে মুক্ত ছিল**”। (২০)

মোটামুটি একশো হিজরি পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক গ্রন্থ রচনার কোনো ব্যাপার ছিল না। ১৫০ হিজরির পূর্বে ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহ. (১৫০ হি.) (তর্কসাপেক্ষে) সর্বপ্রথম সুবিন্যস্ত আকারে গ্রন্থ রচনা করেন—কিতাবুল আসার। (২১) কাছাকাছি সময়ে মক্কায় ইবনে জুরাইজ (১৫০ হি.) ও শামে আওযায়ি (১৫৭ হি.), কুফায় সুফিয়ান সাওরি (১৬১ হি.), এবং বসরায় হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (১৬৭ হি.) সহ বেশ কয়েকজন ইমাম গ্রন্থ রচনা করেন। সুয়ুতি রহ. এককভাবে ইমাম আ'যমকে প্রথম সুবিন্যস্ত গ্রন্থরচনার কৃতিত্ব দিলেও অন্য অনেকে এলাকাভিত্তিক প্রথম রচয়িতা হিসেবে একাধিক গ্রন্থকারকে এই কৃতিত্ব দেন। (২২) দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রন্থ রচিত হলেও গ্রন্থ কেবল ছিল সামনে রাখার জন্য। গ্রন্থ কখনো ইলম অর্জনের মূল মাধ্যম ছিল না। মূল ইলম অর্জন হতো সরাসরি দরসে। কিতাব সামনে থাকত কেবল ভুল-শুদ্ধ নির্ণয়ের জন্য। হয়ত ছাত্র পড়তেন আর উস্তাদ ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করে দিতেন; অথবা উস্তাদ পড়তেন আর ছাত্ররা কিতাবে মিলিয়ে নিয়ে দেখতেন—তার অনুলিপি ঠিক আছে কি না।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইলম অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাঠামো ছিল না। এর আগ পর্যন্ত ইলম অর্জনের মাধ্যম ছিল বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিভিন্ন শায়খের সান্নিধ্যে অবস্থান করা। কেউ-কেউ মসজিদে সাপ্তাহিক দরস দিতেন বটে। তবে সেটা কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের তত্ত্বাবধানে ইসলামের ইতিহাসের স্মরণীয় মন্ত্রী নিযামুল মুলক খাজা হাসান তুসি মুসলমানদের ইলম অর্জনের সুবিধার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোস্বরূপ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন এলাকায় জামিয়া নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন বটে; কিন্তু শিক্ষার ধারা সেই মুতাওয়ারিস ধারাই ছিল। ছাত্ররা উস্তাদদের কাছ থেকে ইলম শিখতেন। এর আগে মিসরে ফাতেমি শাসনের ছত্রছায়ায় জামিয়া আযহার প্রতিষ্ঠিত হলেও সেটি মূলত শিয়াদের বিষবাষ্প ছড়াচ্ছিল বলে একে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থায় গণ্য করা যায় না। (২৩)

মোটকথা, কিতাব রচনার যতই উন্নয়ন ও জোয়ার ঘটুক না কেন, কিতাবের ইলম সহিহভাবে অর্জনের জন্যই রিজালের প্রয়োজন হয়েছে। এখানে অষ্টম শতাব্দীর বিশিষ্ট আলিম আবু ইসহাক শাতিবির (৭৯০ হি.) কথাগুলো সামনে রাখা জরুরি। তিনি লিখেছেন—"**ইলম প্রাথমিকভাবে দুই প্রকার। এক. অতীব জরুরি; যা জন্মগতভাবেই মানুষ জানে। উদাহরণস্বরূপ—জন্মগতভাবেই একটি বাচ্চা এই জ্ঞান নিয়ে জন্মায় যে, খিদে পেলে তাকে কাঁদতে হবে। দুই. তা'লিমের মাধ্যমে যে-ইলম অর্জন করতে হয়। যে ইলম অর্জনের জন্য ভাবনা ও চিন্তার দরকার হয়, সে ইলমের জন্য অবশ্যই একজন মুআল্লিম প্রয়োজন। কেউ-কেউ মতবিরোধ করে—মুআল্লিম ছাড়া আদতে ইলম অর্জন করা সম্ভব, নাকি অসম্ভব? সম্ভাব্যতা মেনে নেওয়া যায় বটে; কিন্তু সাধারণ বাস্তবতা হলো—মুআল্লিম ছাড়া কোনো গতি নেই। সামগ্রিকভাবে এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য আছে।...শিক্ষক যে অপরিহার্য—এটা বোঝার জন্য যুগ-যুগ ধরে চলে আসা শিক্ষাপদ্ধতিই যথেষ্ট। তাছাড়া আলিমগণ তো বলেছেন—'ইলম এককালে ছিল রিজালের অন্তরে; পরে তা স্থানান্তরিত হয়ে গেছে কিতাবের পাতায়। তবে কিতাব খোলার চাবি রয়ে গেছে রিজালের হাতে'**। (২৪)

ইমাম শাতিবি তাঁর সমকালীন ও পুর্ববর্তী আলিমদের মন্তব্য উদ্ধৃত করতে গিয়ে যে-শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হলো—"ওয়াকাদ কালু..."; এর বাংলা করা হয়েছে 'আলিমগণ তো বলেছেন'। "ওয়াকাদ কালু" বলার স্বাভাবিক ধারা থেকে বোঝা যায়—তাঁর সমকালে আলিমদের এই কথা সকলের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল। যার ফলে আলাদা করে এই বক্তব্য কারও দিকে সম্পৃক্ত করে বলতে হয়নি। তার মানে বোঝা যাচ্ছে—অষ্টম শতাব্দীতেও এই কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, কিতাবে ইলম লিপিবদ্ধ হয়ে গেলেও এর চাবিকাঠি ব্যক্তির কাছেই রয়ে গেছে।

এখানে সহিহ বুখারির একটি হাদিস উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ইলম কীভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে—এর বিবরণ দিতে গিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন : "*নিশ্চয় আল্লাহ মানুষদের থেকে ইলম এক দফায় ছিনিয়ে নিয়ে উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদেরকে তুলে নেবার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে একজন আলিমকেও যখন অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষ মূর্খ লোকদেরকে অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করা হবে আর তারা না জেনে ফতোয়া দিবে। তখন এরা নিজেরাও ভ্রষ্ট হবে; অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট করবে*"। (২৫)

অর্থাৎ, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার থাকলেও আলিমদেরকে যখন উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন ব্যক্তির সাথে ইলমও দাফন হয়ে যাবে। এভাবেই একদিন পৃথিবী ইলমশূন্য হয়ে পড়বে।

৫.

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন দাঁড়ায়—তাহলে কিতাব-পুস্তক ও গ্রন্থের কাজ কী? কিতাবের কাজ হলো—ইলমকে লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষণ করা এবং কিতাবে সংরক্ষিত ইলম যেন সহিহভাবে হৃদয়ে সংরক্ষণ, আত্মস্থকরণ ও আমল করা সম্ভব হয়—এজন্য রিজালের সুহবত ও তা'লিমের মাধ্যমে তা অধ্যয়ন করা। এককথায়, কিতাব বা গ্রন্থ হলো ইলম অর্জনের সহায়ক মাধ্যম। মৌলিক ও স্বতন্ত্র কোনো পন্থা নয়। যেমনটা পূর্বে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন বিশিষ্ট গবেষক আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ।

এই প্রশ্নের উত্তর আলি মিয়াঁ আরও সুন্দর করে দিয়েছেন। মুসলমানদের সার্বিক তা'লিম-তরবিয়ত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুতাওয়ারিস ধারাটি আলোচনা করার পর আলি মিয়াঁ লিখেছেন—"**কিতাব তো মূলত ভুল-শুদ্ধ জানার মানদণ্ড। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যেমনটা বলেছেন—'কেউ যদি কাউকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চায়, তাহলে যেন এমন কাউকে আদর্শ বানায়, যিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফিতনার ব্যাপারে নিরাপদ নয়'। তো, কিতাব হলো সালাফে সালিহিনকে অনুসরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু কিতাব, ইলমি পুস্তিকা; ইলমি ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্ক ব্যতীত এসবের ফায়দা অর্জিত হয় না। সুতরাং ইলমি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কহলো প্রকৃতপক্ষে কিতাব থেকে পূর্ণ ফায়দা অর্জন করার মাধ্যম**"। (২৬)

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে—ইলমের সাথে সম্পর্কনেই কিংবা দ্বীনদারির সাথে নতুন পরিচিত হয়েছেন এমন কিছু ভাই; অনেক ক্ষেত্রে বর্তমানের কিছু অপরিণামদর্শী আলিমও এমনটা মনে করেন যে—প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে মুতাওয়ারিস ধারাটির আর দরকার নেই। ইলম আজ অতি সহজলভ্য। গোটাকয়েক আর্টিকেল আর ডজনকয়েক হাদিসগ্রন্থ মুতালাআ করে নিলেই গবেষক বনে যাওয়া যাবে। ইলমের সাথে সম্পর্করাখেন এবং ইলমের মুতাওয়ারিস ধারা সম্পর্কেস্বচ্ছ ধারণা রাখেন—এমন ব্যক্তিমাত্রই দুঃখিত ও ব্যথিত হন এইসব কথায়। বর্তমান ফিতনার যুগে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহী জেনারেল ভাইদের শ্রেণিটিকে নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর মানসিক টানাপোড়নের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার পিছনে কিছু ভাইদের এই মানসিকতা অনেকাংশে দায়ী। রিজালের সাথে সম্পর্কবাদ দিয়ে বিভিন্নধর্মী বই ও দ্বীনী পুস্তক পড়ে দ্বীন ও ইলমে দ্বীন সম্পর্কেজানার প্রবণতা ও গবেষক বনে যাবার বাসনা খুবই ভয়ংকর ও আত্মঘাতী চিন্তা।

এই কর্মপন্থাকে স্পষ্ট ভুল আখ্যায়িত করে মুফাক্কিরে ইসলাম আলি নদভি আক্ষেপ করে লিখছেন—"কিন্তু দুঃখজনক যে-ভুলটি ঘটেছে তা হলো—মানুষজন ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবর্তেকিতাবের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বসে আছে। বইপুস্তককে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে তুষ্টিতে ভুগছে। এতে ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তা হলো—দ্বীন শেখা একটি কঠিন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ইলম শেখার পরিধি হয়ে গেছে অত্যন্ত সীমিত। দ্বীনের ইলম থেকে বঞ্চিত হয়েছে পেশাজীবী ও কর্মব্যস্ত মানুষজন; তাদের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। দ্বীন শেখার সুযোগ হচ্ছে কেবল উম্মাহর গুটিকতক মানুষের; যারা ইলমের জন্য নিজেদেরকে জীবন থেকে ফারেগ করতে পেরেছে। ফলে, ইলম ক্ষুদ্র ও নির্দিষ্ট একটি শ্রেণির মাঝে সীমিত হয়ে পড়েছে। আর উম্মাহর অধিকাংশ মানুষ ডুবে রয়েছে অজ্ঞতা ও হতাশায়..."। (২৭)

এটি অত্যন্ত আশার কথা যে—জেনারেল ভাইদের মধ্যে ইসলামি চিন্তাচেতনা ও বোধের জাগরণ ঘটছে। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ বাড়ছে। কিন্তু এই আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে যদি যথাযথভাবে দ্বীন শেখার পথে ব্যবহার না করা যায়, তাহলে – আল্লাহ মাফ করুন- হিতে বিপরীত হতে পারে। উপমহাদেশের মুফতিয়ে আ'যম মুফতি শফি রহ. অত্যন্ত দরদের সাথে এই চিন্তার গোঁড়ায় হাত দিয়ে সতর্ককরেছেন।

পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে বলেন—"**প্রথম দুর্বলতা চিন্তাগত। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত ভাইদের মধ্যে ইসলাম ও ইসলামিয়াত সম্পর্কেআগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কিছু ভুলের কারণে তাঁদের লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়ে যায় বেশি এবং হেদায়েতের পরিবর্তে সূচনা হয় ফিতনার। একটি ভুল এই যে, কুরআন ও সুন্নাহর ইলম অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত অধ্যয়নই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো—জগতের কোনো বিদ্যা কি শুধু ব্যক্তিগত অধ্যয়নের দ্বারা অর্জিত হয়? এমন একটি দৃষ্টান্তও কি দেখানো যাবে যে, শুধু ব্যক্তিগত অধ্যয়নের দ্বারা কেউ কোনো শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে? তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর ইলম কীভাবে এত তুচ্ছ হয়ে গেল যে, কিছু বইপত্র পড়েই এ বিষয়ে পণ্ডিত হওয়ার আশা করি? আমরা যদি সত্যিই কুরআনের ইলম অর্জনে আগ্রহী হই তাহলে শুধু নিজস্ব পড়াশোনা দ্বারা নয়; বরং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নিয়মানুযায়ী শিখতে হবে এবং নিজস্ব ধারণার ওপর তাঁদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতে হবে**"। (২৮)

সারকথা এই যে, শুধু কিতাবের ওপর নির্ভর করে দ্বীন শেখা ও ইলম অর্জনের সুযোগ নেই। বরং রিজালের সুহবতে কিতাবের সাহায্যে ইলম ও দ্বীন শিখতে হবে।

বই বা কিতাব অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও আছে বেশকিছু শর্ত। তার কিছু উল্লেখ করেছেন আল্লামা আবু ইসহাক শাতিবি, আর কিছু উল্লেখ করেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ। শর্তগুলো দিয়ে লেখা শেষ করছি।

ইমাম শাতিবি লিখেছেন—"**কিতাব পাঠও ইলমের জন্য উপকারী। তবে দুটি শর্তে। এক. কাঙ্ক্ষিত ওই শাস্ত্রের মাকাসেদের 'ফাহম' তথা বুঝ অর্জন করা, সেই শাস্ত্রের শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষা জ্ঞাত হওয়া; যাতে করে কিতাব পড়ে বুঝতে পারে। আর এটা অর্জন করতে হয় আলিমদের যবান থেকে সরাসরি বা এইরকম কোনো পদ্ধতিতে। এটাই পূর্বোক্ত কথাটির মর্ম—'ইলম এককালে ছিল রিজালের অন্তরে; পরে তা স্থানান্তরিত হয়ে গেছে কিতাবের পাতায়। তবে কিতাব খোলার চাবি রয়ে গেছে রিজালের হাতে'। কোনো আলিম উন্মোচন করে না দিলে কিতাব এককভাবে কোনো ছাত্রের সামান্যতম উপকার করতে পারে না। দ্বিতীয় শর্তটি হলো—উদ্দিষ্ট শাস্ত্রবিদগণের মধ্য থেকে মুতাকাদ্দিমিনের কিতাব অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ, পরবর্তীদের তুলনায় পূর্ববর্তীরা ইলমের অধিক নিকটবর্তী**"। (২৯)

একটি কিতাব কীভাবে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে? এর মূলনীতি বলে দিয়েছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ। এক্ষেত্রে মুহতারামের কথাগুলো সামনে রাখা অতীব জরুরি। তিনি লিখেছেন—"**স্পষ্টতই, দ্বীনী কিতাব নামে কেউ কোনো কিতাব লিখলেই তা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে—ব্যাপারটি এমন নয়। কোনো কিতাব নির্ভরযোগ্য ও পাঠকের উপযোগী হওয়ার জন্য দু'টি মৌলিক শর্ত রয়েছে—**

১. গ্রন্থকার বা সংকলক সুন্নতের অনুসারী ও সহীহ আকীদার অধিকারী হওয়া। যে লোক আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাতের 'মুতাওয়ারাছ আকীদা'(৩০) ও 'মুতাওয়ারাছ ফিকর'(৩১) থেকে সরে গিয়ে 'শুযূয' (বিচ্ছিন্ন মত) অবলম্বন করেছে কিংবা যে লোক শরীয়তের পাবন্দ নয় তার রচিত বই সাধারণ পাঠকের পাঠযোগ্য নয়।

২. গ্রন্থে উল্লেখকৃত বিষয়াদি সামষ্টিক বিচারে ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া। মানবরচিত কোনো গ্রন্থে কোন ধরনের ভুলত্রুটিই থাকবে না—এটা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই কোনো গ্রন্থ পাঠের ব্যাপারে এই শর্তারোপ করা যায় না যে, তাতে কোন ভুলত্রুটি থাকতে পারবে না।... এ কারণে এ ক্ষেত্রে শরয়ী উসূল হল, লেখক যদি শরীয়তের পাবন্দ ও সহীহ আকীদার অধিকারী হন, লেখায় কোনো 'ফিকরী শুযূয' (বিচ্ছিন্ন চিন্তা-চেতনা ও মতবাদ) অবলম্বন না করে থাকেন এবং তার গ্রন্থটি সামষ্টিক বিচারে সহীহ ও সঠিক হয় অর্থাৎ সে গ্রন্থের মৌলিক বার্তা সঠিক হয়, তাতে বড় ধরনের ভুলত্রুটি খুব বেশি পরিমাণে না থাকে তাহলে সে গ্রন্থকে নির্ভর করার মত গ্রন্থ গণ্য করা হবে। এ গ্রন্থ পড়তে মানুষকে নিষেধ করা হবে না। তবে সে গ্রন্থের নির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা বা নির্দিষ্ট কোনো মত সম্পর্কেযদি প্রমাণিত হয় যে, তা ইনসাফের অধিকারী এবং সব বিষয়ে সঠিক ও মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী জুমহূর (অধিকাংশ) আহলে ইলমের মতে

মুনকার(৩২) ও গলদ, তাহলে সেই রেওয়ায়েত বা সেই মত অবলম্বন করা ঠিক হবে না। গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে যেমন এই মুনকার রেওয়ায়েত বা মত গ্রহণ করা ঠিক হবে না, তেমনি এ কারণে গ্রন্থ একেবারে বর্জন করাও ঠিক হবে না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শরয়ী মূলনীতি"। (৩৩)

সুতরাং দ্বীন ও ইলমে দ্বীন শেখার মুতাওয়ারিস ও মৌলিক পন্থাটির সহায়ক পন্থা হলো কিতাব ও দ্বীনী গ্রন্থ পাঠ করা। তবে তাও হতে হবে উপরোক্ত শর্তাবলির বিচারে উত্তীর্ণ। নয়ত তা হতে পারে ফিতনার কারণ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং সহিহ ও মুতাওয়ারিস পদ্ধতিতে ইলম অর্জন করার তাওফিক দান করুন।

* * *

(১) মাজমু'আতু রাসাইলিল ইমাম গাযালি, ইলম-অর্জনের পদ্ধতির আলোচনা, পৃষ্ঠা-২৩০; দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি.
(২) সুরা নাহল, আয়াত-৪৩
(৩) সুরা বাকারা, আয়াত-১২৯
(৪) তাফসিরে তাবারি ৩/৮৩-৮৬, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ ১৪২০ হি.
(৫) সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২২৯; মুসনাদে বাযযার, হাদিস নং-২৪৫৮
(৬) সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং-১৪৩১, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.
(৭) মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাতিল মুআছিরাহ, ২/১৫৪২, আলামুল কুতুব, প্রথম সংস্করণ ১৪২৯ হি.
(৮) তাজুল আরুস, মুরতাযা যাবিদি, ৩৩/১২৮, দারুল হিদায়াহ
(৯) বুখারি, পৃষ্ঠা-১৮, দার ইবনে হাযম, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ১৪৩০ হি.
(১০) লিসানুল আরব, ইবনে মানযুর, ১/২৪৪, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ
(১১) মাউসুআতুন নাহবি ওয়াস-সারফি ওয়াল-ই'রাব, ড. আমিল বাদি' ইয়াকুব, পৃষ্ঠা-১৬৮
(১২) ফাতহুল বারি ১/১৬১, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, সংস্করণ—১৩৭৯ হি.
(১৩) মুসনাদে বাযযার ৫/৪২৩, হাদিস নং-২০৫৫; মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, প্রথম সংস্করণ। আল-মু'জামুল কাবির ১৯/৩৯৫, হাদিস নং-৯২৯; মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, কায়রো, দ্বিতীয় সংস্করণ
(১৪) ফাতহুল বারি ১/১৬১, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, সংস্করণ—১৩৭৯ হি.
(১৫) আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকালা—তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩১-১৩২, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.
(১৬) সহিহ বুখারি, পৃষ্ঠা-২০; দার ইবনে হাযম, কায়রো। হুসনুল মুহাযারা ফি আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরা, সুয়ুতি, ১/১৫৭; আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, মিসর। আর-রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস, বাগদাদি, পৃষ্ঠা-১১০, তাহকিক—নুরুদ্দিন ইতর
(১৭) আর-রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস; খতিব বাগদাদি ৪৬৩হি.; পৃষ্ঠা-৭৮; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৫ হি.। শব্দের সামান্য পার্থক্যসহ ঘটনাসমেত হাদিসটি বর্ণিত আছে—সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৬৪১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২২৩
(১৮) মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ রচিত 'এসব হাদীস নয়-২'-এর শুরুতে লিখিত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহর ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১৬, প্রথম সংস্করণ ১৪৩৮ হি.
(১৯) মাজমু'আতু রাসাইলিল ইমাম গাযালি, ইলম-অর্জনের পদ্ধতির আলোচনা, পৃষ্ঠা-২৩০; দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি.
(২০) আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকালা—তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩১, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.
(২১) তাবয়িযুস সাহিফা, পৃষ্ঠা-১২৯, হাফেয সুয়ুতি, ইদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান, সংস্করণ—১৪১১ হি.

(২২) আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফা লিবায়ানি মাশহুরি কুতুবিস সুন্নাতিল মুশাররাফাহ, পৃষ্ঠা-৭, মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল-কাত্তানি, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, অষ্টম সংস্করণ, ১৪৩০ হি.

(২৩) সুলতান আলপ আরসালান, ইমরান রাইহান, দারুল ওয়াফা, প্রথম সংস্করণ, একুশে বইমেলা-২০২০

(২৪) আল-মুওয়াফাকাত ১/৬৪, ইমাম শাতিবি; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি.। ঈষৎ সংক্ষেপিত।

(২৫) সহিহ বুখারি, হাদিস নং-১০০

(২৬) আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকালা—তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩১, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.

(২৭) আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকালা—তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩২, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.

(২৮) তালিবানে ইলম : পথ ও পাথেয়, পৃষ্ঠা-২৫৮, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ; কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের প্রতি—মুফতি শফি রহ.; মাকতাবাতুল আশরাফ, প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৩ হিজরি

(২৯) আল-মুওয়াফাকাত ১/৬৮, ইমাম শাতিবি; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি.

(৩০) "যুগ পরম্পরায় চলে আসা দলিলসিদ্ধ ও স্বীকৃত ইসলামী আকীদা"।

(৩১) "দ্বীনের সেই মৌলিক বোধ ও রুচি-প্রকৃতি, যা যুগ পরম্পরায় দ্বীনের ধারক-বাহকদের মাধ্যমে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছেছে"।

(৩২) "এখানে মুনকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল শাস্ত্রীয় বিচারে তার 'নাকারাত' এত বেশি যে, তাকে 'মাতরূহ' বা 'মওযূ'-এর কাতারে ফেলতে হয়"।

(৩৩) মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ রচিত 'এসব হাদীস নয়-২'-এর শুরুতে লিখিত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহর ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১৬-১৭, প্রথম সংস্করণ ১৪৩৮ হি.

* * *

27/02/2020, 17:21